কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য

বিপ্লবী সংগ্রামের এক মহৎ নারীচরিত্র

প্রভাস ঘোষ

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন

কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য বিপ্লবী সংগ্রামের এক মহৎ নারী চরিত্র — প্রভাস ঘোষ

পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ জুলাই, ২০১৮

প্রকাশক ঃ ছায়া মুখার্জী
সভানেত্রী, অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন
৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ **১০ টাকা**

আমাদের কথা

কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও পুরুলিয়া জেলা কমিটির সম্পাদক ছিলেন। অনারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি ২৩ মে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে পাথেয় করে সংগ্রাম চালিয়ে তিনি কমিউনিস্ট নৈতিকতা ও সংস্কৃতির আধারে এক দৃষ্টান্তমূলক চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন। কীভাবে ও কোন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁর এই উত্তরণ ঘটেছিল, তার সাথে আমাদের পরিচয় ঘটাবার জন্য গত ৪ জুন হাওড়ার শরৎ সদনে আয়োজিত স্মরণ সভায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বক্তব্য রাখেন।

শোষণমুক্তির সংগ্রামের এই মহৎ নারী চরিত্রের সাথে ব্যাপক মানুষের পরিচয় করাবার লক্ষ্য থেকে আমরা কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণটি (গণদাবী ৭০ বর্ষ ৪৩ সংখ্যায় প্রকাশিত) পুস্তক আকারে প্রকাশ করলাম।

বিপ্লবী অভিনন্দন সহ
ছায়া মুখার্জী
সভানেত্রী,
অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন

১৫ জুলাই, ২০১৮
৪৮, লেনিন সরণী
কলকাতা ৭০০০১৩

প্রণতি ভট্টাচার্য

কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য
বিপ্লবী সংগ্রামের এক মহৎ নারীচরিত্র

প্রিয় কমরেড হারানোর গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে। কাজটা খুব কঠিন। বিশেষত আমরা যারা বয়োজ্যেষ্ঠ, তারা যখন কনিষ্ঠ কমরেডদের মৃত্যুজনিত বেদনার সম্মুখীন হই সেটা হয়ে দাঁড়ায় আরও দুঃসহ। তবে আমি ঠিক করেছি, আমার আবেগ কঠোরভাবে সংযত করে আপনাদের কাছে কিছু বলার চেষ্টা করব।

আপনারা জানেন, আমাদের দলটা নিছক একটা দল নয়। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বিপ্লবী লক্ষ্য নিয়ে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে পার্টি গঠনের আরও উন্নত পদ্ধতিতে এবং উচ্চ বিপ্লবী সংস্কৃতির আধারে এই দলটিকে গড়ে তুলেছিলেন একদল সম্পূর্ণ নতুন মানুষ তৈরি করার জন্য। আজকের দিনের সর্বাত্মক অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে তিনি আমাদের মনুষ্যত্ব অর্জনের নতুন পথ দেখিয়েছেন। তাঁর শিক্ষায় আমাদের যে কাজ, সেই কাজ উচ্চতর হৃদয়বৃত্তির কাজ, ভালবাসার কাজ। জনগণের প্রতি ভালবাসা থেকেই, শোষিত জনগণের মুক্তির স্বার্থেই আমাদের দলের বিপ্লবী আন্দোলন। আজ যখন সামাজিক মূল্যবোধের প্রবল সংকটে পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ভেঙে পড়ছে, প্রেম-ভালবাসা ধূলিসাৎ হচ্ছে সেখানে আমাদের গোটা দলটাই একটা পরিবারের মতোই উন্নত ধরনের সর্বহারা সংস্কৃতির ভিত্তিতে নতুন ধরনের ভালবাসার সম্পর্কে সকলেই সম্পর্কিত হয়ে গড়ে উঠছে। এই পরিবারের কোনও কনিষ্ঠ সদস্য, যাঁর বিপ্লবী আন্দোলনে আরও অনেক দেওয়ার ছিল, তাঁকে যখন হারাই, সেটা খুবই বেদনাদায়ক হয়।

আমি জানি প্রয়াত কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যকে নামে আপনারা সকলেই জানেন। তিনি কোন দায়িত্বে ও কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাও আপনারা জানেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু নেতা এবং কর্মী ছাড়া বাকি অনেকের সাথেই তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। এ দায়িত্ব আমার। আজ খুবই দুঃখ হচ্ছে। শিবপুর পার্টি সেন্টারে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রথম শুনে একজন জুনিয়র কমরেড সুস্মিতা তাঁর মৃত্যুর পর আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, কেন প্রণতিদিকে অন্যত্র আলোচনার জন্য পাঠালেন না,

এত সুন্দর সহজ সরলভাবে বুঝিয়ে দেন যে অন্তর স্পর্শ করে! এই আক্ষেপ আমারও। আমি সবে ভাবছিলাম, বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রাজ্যে তাঁকে পাঠাব। সবাই এই চরিত্র জানবে, চিনবে, বুঝবে। তখনই ওঁর এই ভয়ঙ্কর অসুখ ধরা পড়ে। ফলে আর সুযোগ পেলাম না। এখন ভাবছি আরও আগে কেন এই উদ্যোগ নিলাম না।

আপনাদের অনেকের কাছেই যে অপরিচিত প্রণতি ভট্টাচার্য, তাঁকে কিছুটা পরিচিত করার জন্যই আজ আমি কিছু কথা বলব। শোক প্রস্তাবে যে সব বক্তব্য উল্লিখিত হয়েছে, বাংলাদেশের বিপ্লবী নেতা কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর মর্মস্পর্শী বক্তব্যে যে সব কথা পরিস্ফুট হয়েছে সেগুলির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমি যা কিছু বলব, তাঁর সম্পর্কে আমার যে ধারণা গড়ে উঠেছে, আবার যারা তাঁকে চিনত, জানত তাদের থেকেও আমি বক্তব্য সংগ্রহ করেছি, আমার ধারণা ঠিক কি না যাচাই করে নিয়েছি এবং তাঁর সম্পর্কে জানা ছিল না এমন কিছু নতুন তথ্যও আমি পেয়েছি। সবটা বলতে পারব কি না আমি জানি না। আমি চেষ্টা করব। এটাও বলা দরকার, পুরুলিয়া জেলায় আমি খুব কম যেতাম, ছাত্রদের মিটিংয়ে অনেকের মধ্যে তাঁকে দেখতাম। কিন্তু কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যকে জানতে বুঝতে আমারও সময় লেগেছে। আমার পূর্ববর্তী নেতারা, যাঁরা নিয়মিত যেতেন তাঁরা ওঁকে ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন। হয়ত তখনও তাঁর গুণাবলি পরিস্ফুট হয়নি বা তাঁদের কাছে প্রতিভাত হয়নি।

কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যের শৈশব, কৈশোর, যৌবন পশ্চিমবাংলার একটা অন্য পরিবেশে অতিবাহিত হয়েছে। তখনও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মুভমেন্টের প্রভাব ছিল, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের জোয়ারও ছিল, পশ্চিমবাংলাতেও বামপন্থার প্রভাব ছিল। এটা ১৯৬৬-৬৭-৬৮ সালের কথা আমি বলছি। কমরেড রণজিৎদা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, সবচেয়ে অনুন্নত জেলা পুরুলিয়ার কাশীপুরে অনুন্নত এবং অপরিচিত আহাত্তর গ্রামের গরিব পরিবারে তাঁর জন্ম। যে ভাবেই হোক, এই পরিবারে নবজাগরণের প্রভাব, স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাব এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রভাব ছিল। বাবা-মায়ের প্রতি প্রণতি ভট্টাচার্য খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁরা উন্নত রুচিসম্পন্ন ছিলেন। বাড়িতে সাহিত্য চর্চা এবং সঙ্গীতের পরিবেশ ছিল। এই পরিবেশেই তাঁর মনন গড়ে উঠেছিল। পুরুলিয়ায় পার্টি সংগঠন গড়ে তোলেন প্রয়াত নেতা কমরেড প্রীতীশ চন্দ। একদিকে আদ্রাতে রেলের মাধ্যমে যোগাযোগ বের করেছিলেন, অন্য দিকে আড়ষা-বাঘমুণ্ডিতেও তিনি সংগঠন গড়ে তুলেছেন। পুরুলিয়া জেলার পূর্বতন সম্পাদক কমরেড নির্মল মণ্ডলের মাধ্যমেই কমরেড প্রীতীশ চন্দের সান্নিধ্য পান কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য। আমার সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় ১৯৬৮ সালে। আমি ডিএসও-র একটা ছাত্র বৈঠক উপলক্ষে তখন মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে

গিয়েছিলাম। কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য সেই বৈঠকে কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে আসেন। দারিদ্র্যের জন্যই তাঁকে সেখানে দিদির বাড়িতে পড়তে পাঠানো হয়। তাঁর চোখমুখে একটা নিষ্ঠার ছাপ, কিছু করার মানসিকতা আমি লক্ষ করেছিলাম, এর চেয়ে বেশি কিছু বুঝিনি। সে সময়ে জিয়াগঞ্জে পার্টি সংগঠন খুবই দুর্বল ছিল। তৎকালীন মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক প্রয়াত কমরেড প্রাণগৌর বসাককে আমি বলেছিলাম যে এঁকে একটু যত্ন করুন। কারণ স্থানীয় নেতৃত্ব এটা পারবে না। তারপর কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য পুরুলিয়া চলে আসেন। ছাত্রদের প্রোগ্রামে মাঝে মাঝে আমি তাঁকে দেখেছি। আমার যাতায়াত খুব কম ছিল। তখন প্রয়াত কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত পুরুলিয়া জেলা দেখতেন। কমরেড রণজিৎ ধরও মাঝেমাঝে যেতেন। পরে প্রয়াত কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীও যেতেন। কিন্তু যেটা তাঁর বৈশিষ্ট্যের দিক, সবাই তাঁকে খুব একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবেই দেখত, স্নেহ করত, ভালবাসত। সাধারণত একদল কমরেড নেতাদের কাছাকাছি আসে, কথাবার্তা বলে, ঘনিষ্ঠতা চায়। কিন্তু কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য মিটিংয়ে আসতেন, শুনতেন, একাগ্রভাবেই শুনতেন, নিষ্ঠার সাথে কাজও করতেন। কিন্তু নেতাদের খুব কাছাকাছি আসা, ঘনিষ্ঠ হওয়া— এটা তাঁর অভ্যাসে ছিল না। বোধহয় এই কারণেই তৎকালীন নেতাদের দৃষ্টিতে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো ধরা পড়েনি। এরপর আমি যখন রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হই, কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য তখন পুরুলিয়া জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। আর আমি আগে যতটা জেলায় জেলায় ঘুরতাম, কমরেডরা জানেন, রাজ্য সম্পাদক থাকাকালীন আমি সেইভাবে ঘুরিনি। কমরেড নীহার মুখার্জী সাধারণ সম্পাদক হওয়া থেকেই অসুস্থ ছিলেন, আর তখন একটানা আন্দোলন চলছে পশ্চিমবাংলায়, সিপিএমের আক্রমণে বহু কমরেড নিহত হচ্ছেন, শহিদ হচ্ছেন। এর মধ্যেই আমি অনেকখানি কলকাতাকেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছিলাম। ২০০২-০৩ সালে আমি পুরুলিয়া জেলার সাংগঠনিক সমস্যা নিয়ে জেলা কমিটির মিটিংয়ে উপস্থিত হয়ে সেই প্রথম লক্ষ করি তাঁর সাংগঠনিক বাস্তব বুদ্ধি, জুনিয়ার কমরেডদের সম্পর্কে কনসার্ন, সিনিয়ার কমরেডদের সাথে মতপার্থক্য প্রকাশে একদিকে যুক্তিপূর্ণ বলিষ্ঠতা, অন্য দিকে নম্রতা। এই বৈঠকে আমি এসব লক্ষ করে প্রথম আকৃষ্ট হই। তাঁর সম্পর্কে একটা প্রত্যাশাও গড়ে ওঠে। এরপর পুরুলিয়ার সংগঠনে নানা সমস্যা চলছিল। তৎকালীন জেলা সম্পাদক অসুস্থ ছিলেন। কী করা যায় আমরা নেতারা ভাবছি। এই সময়ে ২০০৬ সালে আমি প্রস্তাব রাখি, প্রণতি ভট্টাচার্যকে জেলার দায়িত্ব দিন। আমাদের নেতৃস্থানীয় সিনিয়ার কমরেডরা ওঁকে খুব ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রশ্ন ছিল, অন্য সিনিয়াররা, যাঁদের অধীনে উনি কাজ করতেন, জুনিয়ার হয়ে তাঁদের নেতা হিসাবে এ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন কি না। শেষপর্যন্ত তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় কমরেড নীহার মুখার্জীর মতামত নিই। সব শুনে তিনি

সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এর পর জেলা সম্পাদক হিসাবে সিনিয়ার-জুনিয়ার সকলকেই জয় করে যে দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন তা খুবই উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয়। এর আগে পুরুলিয়া জেলায় কাজকর্মে দুই প্রান্তের মধ্যে কোনও সংযোগ ছিল না। কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য সম্পাদক থাকাকালীন প্রথম দুইটি প্রান্তকে যুক্ত করে একটা ঐক্যবদ্ধ জেলা কমিটির নেতৃত্বে সংগঠন পরিচালিত হতে থাকে। এর আগে জেলার কর্মীদের মধ্যে খোঁজখবর নেওয়ার, স্নেহ ভালবাসা পাওয়ার অভাববোধ ছিল। এই তারা একজন সম্পাদককে পেল যিনি কর্মীদের সুখদুঃখের সাথী, যিনি ভালবাসা মমতা দিয়ে জয় করে সমগ্র জেলার কর্মীদের মাতৃস্থানীয় হয়ে গিয়েছিলেন। বড় যাঁরা ছিলেন, যাঁদের নেতৃত্বে একদিন কাজ করতেন তাঁরাও কিন্তু নির্দ্বিধায় তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে সস্নেহে আস্থার চোখে দেখতেন। শুনেছি জেলা কমিটির মিটিং পরিচালনায় সদস্যদের মধ্যে যারা পুত্রবৎ তাদের সহকর্মীর মর্যাদা দিয়ে এবং বড়দের সাথে ছোট বোনের মতো আচরণ করে সকলেরই মতামত ধৈর্য ধরে শুনে সিদ্ধান্ত নিতেন। এটা খুব সহজ কথা নয়। কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষাকে বুকে বহন করে, দল ও নেতৃত্বের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য প্রকাশে, যে কোনও দুঃসাধ্য দায়িত্ব পালনে, স্বকীয় উদ্যোগে সংগঠন ও গণআন্দোলন গঠনে, দলের নেতা-কর্মী ও জনগণের প্রতি গভীর দরদবোধে, ঐকান্তিক কর্মনিষ্ঠায়, সাবলীল কর্মপ্রবাহের গতিছন্দে, সুদৃঢ় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধে এবং উন্নত রুচিসম্মত বিনম্র আচরণে তিনি দলের ভিতরে-বাইরে অনেককেই জয় করেছেন।

এখানে একটা কথা আমি বলতে চাই। আপনারাই শুধু নয়, মঞ্চে আমরা যারা আছি, সকলের ক্ষেত্রেই একটা শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গেছেন। তাঁর চরিত্রের একটা মহৎ রূপ বলে বহু কমরেড আমাকে জানিয়েছেন এবং আমারও অবজার্ভেশন তাই— তিনি যে নেতা, জেলা সম্পাদক, রাজ্য কমিটির সদস্য, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পরবর্তীকালে স্টাফ মেম্বার, সেটা তাঁকে দেখে একদম বোঝা যেত না। নেতা হওয়ার আগে ও পরে কোনও পার্থক্য তাঁর চলনে বলনে আচরণে কিছু পাওয়া যেত না। তিনি ছিলেন সকলের আপনজন, কাছের লোক, সুখদুঃখের সাথী, যাঁকে মন খুলে সবকিছু বলা যেত। এই যে দিকটা, এটা তাঁর চরিত্রের একটা অত্যন্ত মহৎ দিক ছিল। যেটা সকলের শিক্ষণীয়। কোনও দিন নেতা হতে চাননি, কোন কমিটিতে আছেন ভাবেননি, গুরুত্ব পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না, এ নিয়ে তাঁর কোনও ভাবনাই ছিল না। কাজেই মগ্ন ছিলেন। এটাই তো যথার্থ নেতার গুণ! এটাও ঘটনা, প্রথমবার তাঁকে যখন রাজ্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, আমি কি এর যোগ্য? জবাব দিয়েছি, তুমি যে যোগ্য তার পরিচয় দেবে। স্টাফ মেম্বার ঘোষিত হওয়ার পর দিল্লিতে পার্টি কংগ্রেস অধিবেশনে কেঁদেছেন, আমি দেখেছি। কমরেড নীহার মুখার্জী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, পূর্বতন কিছু

স্টাফ মেম্বার তাঁদের যোগ্যতা হারিয়েছেন। প্রয়াত কমরেড প্রতিভা মুখার্জীও হারিয়েছেন। স্টাফ মেম্বার হিসাবে তাঁর নাম যখন ঘোষণা হল প্রতিভা মুখার্জীকে জড়িয়ে হাউহাউ করে কাঁদছেন। আমি মঞ্চ থেকে লক্ষ করেছি। পরে কমরেড প্রতিভা মুখার্জীও আমাকে জানিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, পূর্বতন স্টাফ মেম্বার কারা থাকবেন, কারা থাকবেন না, কমরেড নীহার মুখার্জীই ঠিক করেছিলেন। আমাদের কাছে কিছু নতুন নাম চেয়েছিলেন। কিছু নাম নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, প্রশ্ন করেছেন, কিছু নামে সম্মতি জ্ঞাপন করেননি। কিন্তু প্রণতি ভট্টাচার্যের নামটা বলার সাথে সাথেই আমি লক্ষ করেছি কমরেড নীহার মুখার্জীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এখনও আমার চোখের সামনে সেই চেহারা ভাসছে। শুধু বললেন, ওকে একটু ডেকে পাঠাও, আমি একটু দেখতে চাই। বুঝলাম, ওনার বুকেও ওঁর স্থান আছে। 'আমি নেতা' এর জন্য কোনও অহঙ্কার, অহমিকা, আত্মপ্রচার, গরিমা লেশমাত্র তাঁর কোথাও ছিল না। এটাই তো যথার্থ নেতার পরিচয়। তিনি যখন রোগশয্যায় তখন কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হন। খুব সংকোচের সাথে কমরেড সৌমেন বসুকে বলেছিলেন, 'আপনারা কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন? আমার এমন কী যোগ্যতা? আমি আর দলকে কী দিতে পারব?'

যদিও একথা আমি বলতে চাই কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যকে আমাদের স্তরের কোনও নেতা পরিচর্যা করে, লক্ষ রেখে, দৈনন্দিন গাইডেন্স দিয়ে গড়ে তোলেননি। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে নিজেকে গড়ে তোলার নিরন্তর সাধনাই তাঁকে এই উচ্চ মানে পৌঁছে দিয়েছিল। সকলেরই বিকাশে এক্সটার্নাল কন্ট্রাডিকশন, ইন্টারনাল কন্ট্রাডিকশন ক্রিয়া করে আমরা জানি। বহির্দ্বন্দ্ব সফল ভাবে কাজ করে অন্তর্দ্বন্দ্ব যদি সাড়া দেয়। অনেক সময় দেখা যায় আমি নেতা হয়ে যাকে ভাল করার চেষ্টা করছি আমার খুব ঘনিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও সে তেমন সাড়া দিতে পারেনি। আবার আমার থেকে অনেক দূরে, মানে আমাদের নেতাদের থেকে অনেক দূরে আছে কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য পড়ছে, শুনছে, অন্য নেতাদের মূল্যবান আলোচনা শুনছে, এসব আহরণ করছে, রক্ত-মাংস-মজ্জায় মিশিয়ে নিচ্ছে। এভাবে নিজেকে গড়ে তোলার সংগ্রামও একজনকে বড় করে তোলে। প্রণতি ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে। তাঁর ক্ষেত্রে— জানলাম একরকম, করলাম আর একরকম, বললাম অন্যরকম— এ সব ছিল না। করতে গিয়ে ভুলত্রুটি হয়নি, তা নয়। এটা তো আমাদের সবারই হয়। কিন্তু ভুল নিজে বুঝে হোক বা অপরে বুঝিয়ে দিক, সংশোধনে কোনও গাফিলতি ছিল না। এটাও সকলেরই শিক্ষণীয়।

আমার সাথে তাঁর ভালভাবে আলাপ আলোচনার সুযোগ হয় ২০০৬ সাল থেকে। একথা ঠিক, তারপর থেকে আমার সাথে খুবই ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। জ্ঞান অর্জনের প্রবল স্পৃহা ছিল তাঁর মধ্যে। প্রথমদিকে খুব পড়াশোনা করেননি।

পরবর্তীকালে খুবই খুঁটিয়ে পড়তেন এবং কোনও প্রশ্ন থাকলেই হয় ফোনে না হয় কলকাতায় এলে জিজ্ঞাসা করতেন। না এলে সপ্তাহে ২-৩ দিন অবশ্যই ফোনে নানা খবরাখবর জানাতেন, পরামর্শ নিতেন, তত্ত্বগত বিষয় জানতে চাইতেন। দর্শন-রাজনীতি, জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, সংস্কৃতি প্রত্যেকটি বিষয়েই তাঁর গভীর ধারণা ছিল। এই তত্ত্বজ্ঞান তাঁর উন্নত হৃদয়বৃত্তি এবং উন্নত সংস্কৃতির আধারে সঞ্জীবিত হয়ে এমন সহজ সরলভাবে ব্যক্ত হত যে সেখানে তত্ত্বের কোনও ঝাঁঝ থাকত না। তিনি মানুষের মনের অত্যন্ত গভীরে ঢুকে যেতেন। সরলতা, সাবলীলতা এগুলো সব তাঁর ছিল, এ কথা সকলেই বলেছেন। আবার খুব বুদ্ধিমতীও ছিলেন। অনেকে অনেকসময় ভুল করে। মনে করে ও খুব সরল, মানে তার বুদ্ধি নেই, এটা ঠিক নয়। বুদ্ধি কম, তার সারল্য একরকম। আবার খুব জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, তিনিও সরল হন। বুদ্ধি তো কোনও জন্মগত বিষয় নয়। বুদ্ধি হচ্ছে যুক্তি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা অর্জন। সঠিক আদর্শের দ্বারা যদি বুদ্ধি পরিচালিত হয় তাহলে সেই বুদ্ধি সৃজনশীল, কল্যাণমুখী হয়। আবার বুদ্ধি যদি বিপথগামী হয় ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে চালিত হয় সেটা কুবুদ্ধি, চালাকি, ধূর্তামি হয়। অতি বুদ্ধিমান অথচ খুবই সরল, তিনি একটা কঠিন, জটিল জিনিসও সরলভাবে অনুধাবন করতে পারেন, ব্যক্ত করতে পারেন। এই ক্ষমতা তাঁর ছিল। যদিও তিনি ঊর্ধ্বতন নেতাদের উপস্থিতিতে, সিনিয়ারদের সামনে সহজে মুখ খুলতেন না। শেখার মন নিয়ে শুনতেন। যার জন্য অনেক সিনিয়ার কমরেড তাঁর জ্ঞানের স্তর জানার সুযোগ পাননি। জুনিয়ারদের মধ্যে স্বল্প কথায় মূল বিষয়টা খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দিতেন।

একই সাথে পার্টিনেতা ও জননেতা হওয়া— সবসময় হয় না। হতে পারলে দুই ক্ষেত্রেই ভূমিকা অনেক উন্নত হয়। পার্টির নেতা পার্টির কর্মীদের গাইডেন্স দেয়, পরিচালনা করে, কমিটি চালায়, কর্মসূচি দেয়, দলের অভ্যন্তরীণ জীবন দেখে, শৃঙ্খলা রক্ষা করে। জননেতা জনগণকে সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে পার্টি নেতা হলেই সকলে জননেতা হয় না। আবার জননেতা হলেই পার্টিনেতা হওয়ার দক্ষতা জন্মায় না। জননেতা— যেমন আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, মহিলা নেতা, যুব নেতা, ছাত্র নেতা, সংগঠনের প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি, কিন্তু এটা হচ্ছে ঘোষিত নেতা। আরেকটা নেতৃত্ব জনগণের সঙ্গে মিশে গরিব মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের ঘরের লোক হয়ে তাদের সুখদুঃখের সাথী হয়ে তাদের সংগঠিত করে নানা প্রতিবাদ আন্দোলন করে তাদের হৃদয়কে জয় করে তাদের নেতা হন। এটা সহজ কথা নয়। পুরুলিয়া জেলায় কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য এইভাবেই নেত্রী হয়েছিলেন। সেইজন্য তাঁর মরদেহ যখন জেলায় পৌঁছায় হাজার হাজার মানুষ চোখের জল ফেলেছেন। বস্তির ঘর, আদিবাসী পাড়া, মুসলিম পাড়া সর্বত্র ছিল তাঁর অবারিত দ্বার। তিনি ছিলেন সকলের ঘরের লোক। শিক্ষিত-অশিক্ষিত-গরিব মানুষ সকলেরই

শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন পুরুলিয়া জেলায়। মতপার্থক্য থাকলেও অন্য দলের নেতা-কর্মীরাও শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের বিপদে আপদে তিনি ছুটে যেতেন। যেখানেই অন্যায় ঘটছে, অত্যাচার হচ্ছে কেউ সাথে থাকুক না থাকুক, ডাকুক না ডাকুক, নির্দেশ দিক না দিক ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এখানে শোকপ্রস্তাবে কিছু আন্দোলন উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এগুলিই সব নয়।

সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ পারিবারিক দুঃখ, নারী জীবনের নিগূঢ় ব্যথা, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, সন্তান নিয়ে সমস্যা যেকোনও ব্যাপারেই তাঁর কাছে ছুটে যেতেন। এরকম অসংখ্য মানুষ আছে যাদের বুকে তিনি স্থান করে নিয়েছিলেন। ট্রেনে যাচ্ছেন, বাসে যাচ্ছেন, মর্নিং ওয়াক করছেন, স্টেশনে বসে চা খাচ্ছেন— সমস্ত জায়গাতেই পাবলিকের সাথে নানা প্রশ্ন নিয়ে আলাপ-আলোচনা, নানা কথাবার্তা বলতেন। তাঁর আলাপ-আলোচনা, কথাবার্তা সবকিছুর মধ্যেই ব্যক্তি প্রণতি ভট্টাচার্যের সাথে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল চলে যেত, তাঁর শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ চলে যেতেন। অনেকেই আছেন পাবলিকের সাথে মেশেন, আন্দোলন করেন, নিজে পপুলার হন, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে দল ও নেতৃত্ব পপুলার হয় না। এটা তাঁরাই পারেন, যাঁদের বিপ্লব ও বিপ্লবী দলই একমাত্র জীবন, আলাদা ব্যক্তিগত সত্তা নেই। আমি একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তাঁর মধ্যে অন্তত আমি ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া বলে কিছু দেখিনি।

কমরেডদের ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে তিনি সমালোচনা করতেন, কিন্তু সেই সমালোচনায় কোথাও এতটুকু আঘাত কেউ পায়নি, বহু কমরেড চোখের জলে আমাকে লিখে জানিয়েছে। সমালোচনায় থাকত ভালবাসা, স্নেহ। আবার অন্যদের সমালোচনাও নির্দ্বিধায় তিনি গ্রহণ করতেন। নিজে ভুল করলে নিজেই স্বীকার করতেন এমনকী ছোটদের কাছেও। ছোট বড় নির্বিশেষে সকলের কাছ থেকে শিখতেন। কেউ কোনও কারণে আঘাত দিয়ে কথা বললেও পাল্টা আঘাত দেওয়ার আচরণ তাঁর ছিল না। বরং তাকেও ভালবাসায় কাছে টেনে নিয়েছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বিপ্লবী চরিত্রের যে গুণাবলি চেয়েছিলেন কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য নিরলস সংগ্রাম করে তার অনেকগুলিই অত্যন্ত সহজ সাবলীলভাবে নিজের নাড়ির সাথে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন। এটা সহজ কথা নয়, একেবারে নিজেকে ভেঙে গড়ে তোলার সংগ্রাম চালানো। যেখানেই গেছেন সেখানেই ছাপ ফেলেছেন। বাঁকুড়া জেলায় অনেক সমস্যা ছিল, নেতাদের বোঝাপড়ার সমস্যা, কর্মীদের বোঝাপড়ার সমস্যা ছিল। এর আগে যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা সবটা সমাধান করে যেতে পারেননি। কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যকে দায়িত্ব দেওয়া হল। এক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কর্মক্ষেত্র তাঁর পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া, এই দুটি জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র এলাকায় কাজের মধ্যেই তিনি

বৃহৎ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দলীয় মুখপত্রে তাঁর কোনও ভাষণ, রচনা প্রকাশিত হয়নি। এই নিয়ে তাঁর কোনও পরিচয়ই নেই। কিন্তু যে উজ্জ্বল প্রাণবন্ত চরিত্রের পরিচয় তিনি রেখে গেছেন, তা ওই দুই জেলার গণ্ডিকে অতিক্রম করে গেছে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ চেয়েছিলেন, আমাদের দলের মহিলারা মেয়ে নয়, মানুষ হোক। পুরুষশাসিত সমাজের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে যে হীনমন্যতাবোধ, পুরুষনির্ভরশীলতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, স্বামী-সন্তানের প্রতি দুর্বলতা এবং সঙ্কীর্ণতা দেখা যায়, সেগুলোর থেকে মুক্ত হয়ে মহিলারা বলিষ্ঠ চরিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করুক। এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। এটা আমার দুঃখ, কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য কমরেড শিবদাস ঘোষকে পেয়েছিলেন দূর থেকে। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষ কাছ থেকে তাঁকে পাননি। সেই সময় পুরুলিয়া জেলার দু-এক জন মহিলা কর্মী ছিলেন যাঁদের বাইরে থেকে সম্ভাবনাময় বলে মনে হত। আমাদের তৎকালীন নেতারা তাঁদের কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছে হাজির করেছেন, কিন্তু তাঁরা কঠিন সংগ্রামে বেশিদূর এগোতে পারেননি। কিন্তু প্রণতি ভট্টাচার্য এই সুযোগ পাননি। কারণ আমি আগেই বলেছি তিনি সব সময় পিছনে থেকেই নিঃশব্দে কাজ করতেন, বাইরে থেকে সহজে তাঁকে বোঝা যেত না, আর তখন লাজুকও ছিলেন। আমি মনে করি তাঁকে দেখলে কমরেড শিবদাস ঘোষ খুব খুশি হতেন, আনন্দিত হতেন। দেহে নারী, কিন্তু প্রচলিত নারীসুলভ কোনও দিক তাঁর মধ্যে ছিল না। কোমলতায়-কঠোরতায় এক স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

সেইসময়ে কমরেড স্বপন ঘোষ চাকরি ছেড়ে হোলটাইমার হয়েছেন। সেন্টারে অত্যন্ত অভাব অনটন, তখন দলের আর্থিক সামর্থ্যও ছিল না। পাড়া-প্রতিবেশীরা সাহায্য করতেন। কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য পায়ে হেঁটে গোটা শহর ঘুরে বেড়াতেন। আমি কমরেডদের কাছে শুনেছি সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে পার্টির কাজ করতেন। আবার ফিরে এসে একমাত্র মহিলা কমরেড হিসাবে সেন্টারের কাজও করতেন। দারিদ্র্য অভাব অনটন ছিল, কিন্তু এসবের সাধ্য কী তাঁকে স্পর্শ করে! গান গেয়ে, কবিতা আবৃত্তি করে একটানা আনন্দে কাজ করে গেছেন।

কমরেড বুলবুল আইচ খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন, প্রণতি ভট্টাচার্যের মধ্যে বিবাহিত জীবনের যে সৌন্দর্য দেখলাম— কে তাঁর স্বামী, কে তাঁর সন্তান— এটা বোঝা যেত না। আমি এই চিন্তার সঙ্গে সর্বাংশে একমত। তাঁর দাম্পত্য জীবন, সন্তান সম্পর্কে অ্যাপ্রোচ অত্যন্ত অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। সন্তানকে মানুষ করেছেন, বস্তিতে বস্তিতে, পাড়ায় অন্যের বাড়িতে রেখে কাজে বেরিয়ে যেতেন। এখানেও আপনাদের আমি বলতে চাই, দুই বছর কঠিন ব্যাধির সাথে লড়েছেন। প্রায় সময়ই কলকাতায় শিবপুর সেন্টারে এবং হাসপাতালে ছিলেন। কিন্তু একটা দিনও বলেননি একবার

ছেলেকে দেখব। অন্যান্য কমরেডদের ডেকে পাঠিয়েছেন, কাজকর্মের খোঁজ নিয়েছেন। বুঝেছিলেন মৃত্যু অনিবার্য, তার জন্য অন্য কমরেডদের মানসিক, সাংগঠনিক দিক থেকে প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু কোনওদিন বলেননি ছেলেকে একবার দেখলে ভাল হত। বললে কোনও অন্যায় ছিল না। এটাই ছিল স্বাভাবিক। আমি একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলেকে ডাকব? বললেন, থাক ও কাজ করছে, কাজ শিখুক। ও এসে কী করবে? মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের এই মানসিকতা কত বড় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় সৃষ্ট এ এক অমূল্য সম্পদ। সন্তানও তাই। সেও কোনও দিন বলেনি যে মায়ের কাছে একটু যাব। দু'বার ডেকে পাঠিয়েছিলাম, এসেছিল, দেখা করে চলে গেছে। মৃত্যুর দু'দিন আগে আনিয়েছিলাম। বলল, আমি চলে যাচ্ছি, ওখানকার কমরেডদের দেখতে হবে, শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করতে হবে। আশা করি সেই সন্তান মায়ের স্বপ্নকে সফল করবে, বড় হবে। এ রকম আরও বেশ কিছু ছেলেমেয়েকে এইভাবে মাতৃস্নেহে মানুষ করেছেন। সন্তান বিপথগামী হচ্ছে, মা-বাবা-বাড়ির লোক অসহায়, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যের কাছে পাঠানো হল, তাঁর স্নেহের পরশে সেও সম্পূর্ণ পাল্টে গেল এমন দৃষ্টান্তও আছে। আশা করি এই সন্তানরা তাঁর স্নেহের মর্যাদা দিয়ে দলের বড় দায়িত্ব পালন করবেন। এই যে মাতৃত্ব, যে নৈর্ব্যক্তিক মাতৃত্ব বা এথিক্যাল মাদারহুড কমরেড শিবদাস ঘোষ চেয়েছিলেন, আহ্বান করে মহিলাদের বলেছিলেন শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের নারায়ণী, বিন্দু হও, সেই মাতৃত্বই প্রণতি ভট্টাচার্যের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে এ কথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি। এসব যে করেছেন এই নিয়েও কোনও আত্মপ্রচার কোথাও করেননি। শুধু মৃত্যুর কয়েক দিন আগে তাঁর ঘনিষ্ঠ স্নেহের পাত্রপাত্রী সদ্য বিবাহিত দুই কমরেডকে এ সম্পর্কে মূল্যবান গাইড লাইন দিয়ে গেছেন, তাঁদের কাছে শুনেছি। আশা করি তাঁরাও এর মর্যাদা রক্ষা করবেন।

আরেকটা কথা বলছি। আমি দেখেছি, কোনও কমরেড সম্পর্কে কোনও দিন তিনি কোনও অভিযোগ করেননি। একমাত্র অভিযোগ ছিল তাঁর নিজের বিরুদ্ধে। আমি কেন আরও ভাল করে কাজ করতে পারছি না? কমরেড শিবদাস ঘোষ এত কথা বলেছেন, এত আলোচনা করেছেন, আপনারাও বলছেন, আমি কেন সেইভাবে করতে পারছি না? এই অভিযোগ ছিল নিজের সম্পর্কে। এখানে একটা কথা আমি বলতে চাই। একবার আমি তাঁকে দুঃখ দিয়েছিলাম। আমি জানতাম তিনি সমস্ত কমরেডদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। এ ভালবাসায় কোনও পার্থক্য তিনি করেননি কখনও। তবুও একজন কমরেড এসে আমাকে বলেছিল যে কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যের মধ্যে খানিকটা পক্ষপাতিত্ব দেখছি। বিশ্বাস না করলেও আমি তাঁকে এটা জানিয়েছিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন খানিকটা বিস্ময় ও খানিকটা ব্যথা নিয়ে। তারপর বললেন, 'কেন বলল, আমাকে ভেবে দেখতে হবে'। আর কিছু

বলেননি। সেদিন পুরুলিয়ায় ফিরে গেলেন। আমারও মনটা খারাপ ছিল। আমি পরদিন ওঁকে ফোন করলাম। সেই ঘটনা সম্পর্কে এখন ওঁর ডায়েরি থেকে আপনাদের একটু পড়ে শোনাব। ২০১৫, ১ জানুয়ারি, লিখছেন, 'মনটা খারাপ হয়ে আছে আমার। আমাকে নিয়ে প্রশ্ন এসেছে। মনে হচ্ছে কোথাও ভুল হচ্ছে। জানি না কোনওদিন হয়তো সত্য প্রকাশ পাবে'। পরের দিন লিখছেন, 'সকালে প্রভাসদা ফোন করেছিলেন। বললেন, মন খারাপ কেন? বুঝতে পেরেছেন আমার মন ভাল নেই। বললেন, জীবনে নানা ধরনের সমস্যা আসবে, ভুল সমালোচনাও আসবে। কিন্তু মন খারাপ করলে চলবে না। ওনার সাথে কথা বলার পর মন ভাল হল।' এর পরে যেটা পড়ছি, সেটা ভাল করে শুনবেন। লিখছেন, 'আমার তো আলাদা করে কেউ প্রিয়জন নয়। আমি তো সকলকেই ভীষণ ভালবাসি। দুঃখ, ও কেন এটা ধরতে পারল না।' এই হচ্ছেন প্রণতি ভট্টাচার্য। আর একটা ঘটনা বলি, মেদিনীপুরে ডিএসও-ডিওয়াইও-র একটা ক্লাস ছিল। প্রচণ্ড গরম ছিল। ওঁর আসার ইচ্ছা ছিল। তিনি তখন পা ভেঙে পড়ে আছেন। আসতে পারছেন না বলে ফোন করেছেন। ঠিক করলাম তাঁকে দেখতে যাব। আমার সাথে কমরেড হায়দারও ছিলেন, পুরুলিয়ায় গেলাম। খুব গরমের মধ্যে তিনি ভাঙা পা নিয়ে আমাদের দেখাশোনা করতে ছুটে এসেছেন। তারপর পায়ের যন্ত্রণা আরও বাড়ল, আমি বকলাম। ডায়েরিতে লিখেছেন, 'আমাদের নেতাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অন্যদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। ওনাদের কীভাবে একটু ভাল রাখা যায় এটাই প্রধান চিন্তা থাকে তখন। তখন আর কোনও জ্ঞান থাকে না। জীবনটা দিয়ে দিতে পারি ওনাদের ভাল রাখার জন্য। আমি কি একটু পাগলের মতো ভালবাসি? জানি না! হায়দারদা অসুস্থ মানুষ। খুব কষ্ট হয়েছে ওঁর। এতটা রাস্তা, প্রচণ্ড গরমে প্রভাসদা বিধ্বস্ত হয়ে গেছেন।' নেতাদের সম্পর্কে এই ফিলিং, এই ইমোশন, এই হচ্ছে তাঁর চরিত্রের আরেকটা দিক। আবার কোনও কমরেড পিছিয়ে যাচ্ছে, তাকে সাহায্য করতে হবে এগোবার জন্য। সেই কমরেডকে দায়ী না করে নিজেই ভাবছেন, আমি কেন তাকে সাহায্য করতে পারছি না। এটা আমারও ব্যর্থতা। যারা একদিন কাজ করতো, বয়স্ক, শারীরিক কারণে অসুস্থ বা পারিবারিক দুর্বলতার কারণে জড়িয়ে গেছেন তাঁদের প্রতিও তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। সবসময় অন্যের গুণ নিয়েই আলোচনা করতেন। কমরেডরা কারও ত্রুটি বললে, তার গুণটা দেখিয়ে দিতেন। ছোট বড় সকলকেই মর্যাদা দিতেন। বহু কমরেড আমাকে জানিয়েছেন, এইসব বৈশিষ্ট্য আমিও জানতাম। আমি নিজে দেখেছি, অন্যের প্রশংসা শুনলে খুশি হতেন, আর তাঁর যদি প্রশংসা করা হত, লজ্জা পেতেন। অপরের সাথে প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা, বিরক্তি, ঈর্ষা, বিদ্বেষ — যেগুলি এই বুর্জোয়া সমাজ থেকে আসে, তার লেশমাত্র আমি তাঁর মধ্যে দেখিনি।

আবার লক্ষ করুন, কীভাবে উনি মারণ ব্যাধির সঙ্গে লড়াই করেছেন। ডাক্তার

তরুণ মণ্ডল সভায় বসে আছেন, উনি বলেছেন, দিল্লিতে যখন ক্যান্সার ধরা পড়ল, ভাবছেন কীভাবে প্রণতিদিকে বলবেন। বলছেন, প্রণতিদিকে বলতে হয়নি। তিনি নিজেই বুঝে গেছেন এবং সহজ, স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছেন। ডাক্তাররা কী বলছেন, অসুখ নিয়ে কী বুঝছেন, না বুঝছেন— এ সব নিয়ে একটা প্রশ্নও কোনওদিন করেননি। তিনি ভেবেছেন, দল দেখছে, দলই যা করার করবে, আমি কী ভাবব? এই যে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্তভাব, এটাও কত বড় দৃষ্টান্ত। তরুণ মণ্ডল একথাও বলছেন, ওঁর এই যে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, আমি প্রথমে বুঝতেই পারিনি, কারণ বাইরে তাঁর কোনও এক্সপ্রেশন ছিল না। এটা তাঁর জীবনের শেষ দিকের অধ্যায়। এ-ও আমাদের কাছে একটা অসাধারণ দৃষ্টান্ত। ক্যান্সার রোগে কী ভীষণ যন্ত্রণা হয়, আপনারা যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা জানেন। কিন্তু এই অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও কোনও দিন এতটুকু কান্না, ছটফটানি, হা-হুতাশ, যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। সব কিছুই নীরবে নিঃশব্দে সহ্য করেছেন। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, হ্যাঁ একটু ব্যথা হচ্ছে। মুখে বলতেন একটু, বাস্তবে ছিল অসহ্য যন্ত্রণা। সেটা হাসিমুখেই বলতেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এটাই ছিল তাঁর আচরণ। মানে নিজের কষ্ট প্রকাশ করে, অন্যকে তা জানিয়ে অন্যদের কষ্ট দিতে চাননি। এ কত বড় ক্ষমতা, কত বড় মানসিকতা! নিজে সারা রাত ঘুমোতে পারেননি, কিন্তু তাঁকে যারা দেখছে, তারা জাগতে চাইলেও জাগতে দেননি। যতক্ষণ পেরেছেন টলতে-টলতেও বাথরুমে গেছেন, অন্যকে ডাকেননি। যারা দেখা করতে এসেছেন তাদের সাথে কাজকর্ম নিয়ে কথাবার্তা, আলোচনা করেছেন, নানা সাজেশন দিয়েছেন। আর এই যন্ত্রণার মধ্যেও ছিল গান শোনার প্রবল আগ্রহ। প্রায় প্রতিদিনই কমরেডদের নিয়ে গানের আসর বসাতেন। গানের ক্যাসেট শুনতেন, নিজেও মাঝে মাঝে গলা মেলাতেন। ছোটবেলায় গানের শখ ছিল, ভাল গলা ছিল, গায়ক হওয়ার ইচ্ছা ছিল। দলে যুক্ত হওয়ার পর বিপ্লবী রাজনীতিকেই সঙ্গীতরূপে আরাধ্য হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবী রাজনীতির সাথে তাঁর সঙ্গীতজীবন মিশে গিয়েছিল। জীবনের শেষ অধ্যায়ে যারাই এসেছে, পারুক না পারুক গান গাইয়েছেন। পুরনো দিনের গান, ক্লাসিকাল গান, রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীত— এসব শুনতেন। আমি শুনেছি, মৃত্যুর দু'দিন আগে, এই হাউসে আছে কমরেড কুমকুম, তাকে দিয়ে গান করিয়েছেন, সে ভাল গায়। সে কোথাও একটু সুর ভুল করছে, কথা ভুলে গেছে— ধরিয়ে দিয়েছেন। এই রকম মানসিকতা ছিল তাঁর। নিজের রোগ নিয়ে দুশ্চিন্তা নয়, পার্টির কাজকর্ম নিয়ে চিন্তাভাবনা, নানা বইপত্র পড়া ও শোনা আর সংগীতের চর্চা এই নিয়েই রোগাক্রান্ত দিনগুলি কাটিয়েছিলেন।

শিবপুর সেন্টারে থাকতেন। দিনের বেলা আমার সাথে বিশেষ দেখা হত না। রাতে ঘুম হত না, সেজন্য দিনের বেলা শুয়ে থাকতেন। আমি ডিসটার্ব করতাম না।

আমি যখন রাত সাড়ে আটটা-ন'টায় পার্টি অফিস থেকে ফিরতাম, সেই সময়ে দেখা করতাম। এই সময়ের জন্য আকুল আগ্রহে বসে থাকতেন। অনারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, অসহ্য যন্ত্রণায় বিদ্ধ, অনিবার্য মৃত্যু যাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে— আমি তাঁকে কী সান্ত্বনা দেব! শুধু জিজ্ঞেস করতাম, ব্যথা আছে? হাসিমুখে একই উত্তর ছিল, একটু আছে। মৃত্যুর পরে আমি শুনেছি, দু'জন কমরেড আমাকে বলেছেন, আমি আসার আগে পর্যন্ত বিছানায় কাতর হয়ে শুয়ে থাকতেন। আমার আসার সময় উঠে বসতেন, চুল, চেহারা ঠিকঠাক করে নিতেন। মানে আমার কাছে হাসিমুখ নিয়েই দেখানো যে, আমি ভাল আছি। হয়ত আমাকে দেখার আনন্দ, না হয় আমি দুঃখ না পাই তার জন্য। এগুলো ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। সারা দেহে ছড়ানো ক্যান্সারে আক্রান্ত যে যন্ত্রণায় মানুষ ছটফট করে— যে যন্ত্রণায় অনেকে বিষ চায়, আত্মহত্যা করে, সেখানে তিনি এভাবে অত্যন্ত সহজ ভাবে আচরণ করে গেছেন, এটা খুবই বিস্ময়কর। এখানেও কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা— অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও একজন বিপ্লবী কীভাবে লড়াই করে তিনি দেখিয়ে গেলেন। আমাদেরও একদিন এই পরীক্ষা দিতে হবে।

হাসপাতাল থেকে ওঁরা জানিয়েছেন, সমস্ত ডাক্তার, স্টাফ, নার্স, যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের কারও সন্তান নিয়ে সমস্যা, কারও বিবাহিত জীবনের সমস্যা, নিজেদের বোঝাপড়ার সমস্যা, এ সব নিয়ে তাঁদের পরামর্শ দিয়েছেন, গাইড করেছেন। তাঁদের পার্টির বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন, মানুষ হতে শিখিয়েছেন। মৃত্যুর দু'দিন আগে একজন নার্সকে জিজ্ঞেস করেছেন, তার সমস্যার কী হল। অর্থাৎ তিনি যেভাবে গাইড করেছেন, তাতে সমাধান হয়েছে কি না। আমাদের সকলের কাছে কত বড় শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত! হাসপাতালে যাঁরা যান, তাঁরা কি এমনভাবে সকলের গার্জিয়ান হতে পারেন? অর্থাৎ শেষনিঃশ্বাস ফেলার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যাকেই পেয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে কিছু না কিছু বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এটাই ছিল তাঁর একমাত্র সাধনা। শিবপুর সেন্টার থেকে যখন হাসপাতালে শেষবারের মতো যান আমি দোতলায় দেখা করলাম, আমি জানতাম আর ফিরবেন না। পরে আবার নিচে গিয়ে দেখা করলাম। ওই অবস্থায় বললেন, আপনি এখানে এলেন কেন? আমি হাত ধরে বললাম, তোমার সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করব। বললেন, না, একদম আসবেন না। ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত বলছেন, ওকে বারবার বলেছেন, প্রভাসদা যেন একদম এখানে না আসেন, এখানে এলে ওঁর ইনফেকশন হবে। মৃত্যুর আগের দিন সুভাষকে শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন, 'সুভাষ তোমাদের তো আর করার কিছু নেই, এবার আমাকে ছেড়ে দাও'। আর, শেষবারের মতো জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভাসদা কী রকম আছেন'। ও জানালো, ঠিক আছেন। অর্থাৎ প্রভাসদারা, নেতারা বেঁচে থাকুন, সুস্থ থাকুন, দলের কাজ যাতে চালিয়ে

যেতে পারেন। এই তাঁর শেষ কথা। সুভাষ রাতে আমার অনুমতি নিয়ে ঘুমের ইনজেকশন দেওয়ালো, ডাক্তার-নার্স-স্টাফরা এই দৃশ্য দেখে চোখের জল ফেলছিল। সুভাষ বলেছেন, তাঁর মৃত্যুতে শুধু আমরা, আপনারাই নন, গোটা হাসপাতালও কেঁদেছে। সেখানেও এমনই আপনজন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

আমরা সকলেই মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে জীবন সংগ্রাম চালাচ্ছি। উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের জন্য প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছ থেকে শিখছি কে কীভাবে কতটা এই অমূল্য বৈপ্লবিক শিক্ষাকে জীবনে প্রয়োগ করতে পেরেছে। আজ এই স্মরণসভায় প্রয়াত কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যের জীবন সংগ্রামের কিছু অধ্যায় আপনাদের কাছে উপস্থিত করলাম যাতে অত্যন্ত সাধারণ স্তর থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে সংগ্রাম চালিয়ে কী অসাধারণ স্তরে নিজেকে উন্নীত করা যায়— জীবিত আমরা যারা আছি সেটা যাতে উপলব্ধি করতে পারি, অনুপ্রাণিত হতে পারি।

১৯৫০ সাল থেকে পার্টিতে আছি। এত কমরেডের শহিদ হওয়া, এত কনিষ্ঠ কমরেডদের মৃত্যু দেখছি— ভাবছি আর কতদিন দেখতে হবে! আবার, স্মরণ করি, মনে শক্তি সঞ্চয় করি, মহান লেনিনের মৃত্যুর পর মহান স্ট্যালিন যে শপথবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন তার থেকে। মহান স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর মহান মাও সে-তুঙ বলেছিলেন, টার্ন গ্রিফ ইনটু স্ট্রেংথ, অর্থাৎ শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত কর। আর স্মরণ করি, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর মৃত্যুর পর কমরেড শিবদাস ঘোষের অবিস্মরণীয় শিক্ষা, 'বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। এ একদিকে যেমন কোমল, আর একদিকে এর মধ্যে রয়েছে কঠোর বাস্তবতা, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, কঠোর ও কঠিন কর্তব্যপরায়ণতা। শোকের জন্য বিপ্লবীদের কাজ থেমে থাকে না।' বলেছেন, 'অত্যন্ত প্রিয়জনের মৃত্যু, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা, অত্যন্ত হৃদয়াবেগের ঘটনা, তার মধ্যেও বিপ্লবীরা কর্তব্যকে অবহেলা করতে পারে না। বিপ্লবী রাজনীতি বাইরে থেকে দেখতে এমনই নিষ্ঠুর, আবার বাইরের দিক থেকে যা দেখতে নিষ্ঠুর তার মধ্যেই রয়েছে যথার্থ শোকোপলব্ধির তাৎপর্য।' যত মৃত্যুর সম্মুখীন হই, ততবার মহান নেতাদের এই শিক্ষাগুলিকে স্মরণ করি, শক্তি সঞ্চয় করি। আপনাদেরও বলব, এই ভাবেই শক্তি সঞ্চয় করবেন। আমরা যখন থাকব না, সেদিনও মহান শিক্ষকদের এই শিক্ষাগুলি নিয়েই আপনাদের চলতে হবে। এ কথা বলেই আমি আজ শেষ করছি।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ
কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য লাল সেলাম
সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ লাল সেলাম

কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য স্মরণে কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্য

৪ জুন হাওড়ার শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় এই শ্রদ্ধার্ঘ্যটি পাঠ করেন সভার সভাপতি কমরেড সৌমেন বসু।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, পুরুলিয়া জেলা কমিটির সম্পাদক এবং বামপন্থী আন্দোলন ও গণআন্দোলনের নেতা প্রয়াত কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যের বিপ্লবী জীবনসংগ্রামের প্রতি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

"উন্নততর সাংস্কৃতিক মান অর্থাৎ সর্বহারা সংস্কৃতিগত মান আয়ত্ত করা ব্যতিরেকে বিপ্লবী তত্ত্ব বিচারের ক্ষমতাকেই সঠিকভাবে অর্জন করা যায় না এবং বিপ্লবী তত্ত্বও সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না। এই কারণেই বিপ্লবী রাজনীতিকে কার্যকরীভাবে রূপ দেওয়া মানেই হচ্ছে বাস্তবে জীবনটাকেই পরিবর্তিত করা।" সর্বহারার মহান নেতা এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের এই শিক্ষা কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি বিপ্লব এবং বিপ্লবী জীবনকেই একমাত্র সাধনা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য ১৯৬৮ সালে ১৭ বছর বয়সে মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ কলেজে পড়ার সময় ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র সাথে যুক্ত হন। ১৯৭০ সালে তিনি নিজ জন্মস্থান পুরুলিয়া জেলায় ফিরে আসেন এবং রঘুনাথপুর কলেজে ভর্তি হন। ওই সময় তিনি প্রয়াত কমরেড নির্মল মণ্ডলের সাথে যোগাযোগের মারফৎ দলের পলিটব্যুরো সদস্য প্রয়াত কমরেড প্রীতীশ চন্দের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁরই মাধ্যমে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা ও জীবন দর্শনের সংস্পর্শ লাভ করেন এবং একজন বিপ্লবী হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার সংগ্রাম শুরু করেন ।

কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যের সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া পুরুলিয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের অতি সাধারণ এক নারীর কমিউনিস্ট বিপ্লবী হওয়ার জীবন্ত সাধনা। তিনি স্কুল-কলেজে শিক্ষা নিয়েছিলেন, কিন্তু গরিব মানুষের প্রতি অফুরন্ত ভালবাসা তাঁকে শুধু স্কুল-কলেজের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। পুরুলিয়া জেলার গরিব মানুষ

অধ্যুষিত গ্রামগুলিই তাঁর কাছে ছিল প্রবল আকর্ষণস্থল। ১৯৭০-'৭২ সাল পর্যন্ত রঘুনাথপুর কলেজে পাঠরত থাকাকালীন একদিকে জেলার ছাত্র আন্দোলন সক্রিয়ভাবে গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করেন, পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া পুরুলিয়া জেলার গরিব মানুষের আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন। তিনি এ আই ডি এস ও-র পুরুলিয়া জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন এবং রঘুনাথপুর কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচিত সদস্য হিসাবে পত্রিকা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। কলেজে পাঠরত অবস্থায় পুরুলিয়া জেলায় কাশীপুর থানার পার্টি সংগঠনের কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। পড়াশুনা অসম্পূর্ণ রেখে তিনি কাশীপুর থানার গ্রামে গ্রামে গরিব মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন, তাঁদের মাঝেই দিন কাটাতেন। এ ভাবেই তিনি গরিব মানুষের পরিবারগুলির অত্যন্ত প্রিয় 'ছোড়দি' হিসাবে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৭৮ সালে তিনি কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য হন।

কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য ছিলেন অত্যন্ত সহজ, সরল, প্রাণবন্ত, সাহসী, দৃঢ়চেতা, উদার মনের, উচ্চ-সংস্কৃতি সম্পন্ন ও কোমল হৃদয়ের। তথাকথিত এবং প্রচলিত নারীসুলভ মন তাঁর ছিল না। দলমত নির্বিশেষে খুব সহজে তিনি যে কোনও মানুষের সাথে অত্যন্ত সাবলীলভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে এবং মন জয় করে নিতে পারতেন। ছোটদের প্রতি ছিল তাঁর অপার স্নেহ এবং তিনি ছিলেন যথার্থ মাতৃসম, বয়স্কদের প্রতি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল। পার্টি সংগঠন ও গণআন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে জননেত্রী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষানুযায়ী পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি কমিউনিস্ট বিপ্লবীর ধারণা অনুযায়ী চলার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর কাছে পারিবারিক সম্পর্কের বাঁধন ছিল পার্টি আদর্শকেন্দ্রিক। কেউ বলুক না বলুক, পরিচিত হোক বা অপরিচিত এলাকা হোক, কোনও নির্দেশের অপেক্ষা না করে তিনি আপন উদ্যোগে সাধারণ মানুষের যে কোনও সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। অত্যন্ত বিরুদ্ধ পরিবেশেও তিনি কাজ করতে পারতেন। অভাব, অনটনের কষ্টকর দিনগুলিতেও হাসি মুখে আনন্দের সাথে পার্টির কর্মকাণ্ডে তিনি মগ্ন থেকেছেন, এর প্রভাব তাঁর পার্টির কাজে কখনও ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি। যে কোনও স্তরের পার্টি নেতা সম্পর্কে হোক বা কোনও কর্মী সম্পর্কেই হোক কোনও সমালোচনা বা কোনও বক্তব্য থাকলে তিনি সরাসরি সাবলীলভাবে বলতে পারতেন। আবার তিনি কোনও ভাবে সমালোচিত হলে সহজভাবেই নিতে পারতেন। ছোট হোক বড় হোক কেউ ভুল ধরিয়ে দিলে এবং তা বুঝতে পারলে, সেই ভুল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তাঁর প্রতি কোনও অবিচার হলেও কারও প্রতি কোনও বিরূপ মন নিয়ে চলতেন না, তাঁদের সাথেও সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে পারতেন। তিনি দলের রাজনীতি সহজভাবে মানুষের কাছে রাখতে পারতেন এবং দলের রাজনীতির দক্ষ প্রচারক ছিলেন।

তিনি পুরুলিয়া জেলা খরা প্রতিরোধ আন্দোলন, নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলন, মদ বিরোধী আন্দোলন, বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন ও স্থানীয় নানা সমস্যা নিয়ে আন্দোলন অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত নিরলসভাবে চালিয়ে গিয়েছেন। তিনি গণআন্দোলন বিশেষ করে নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে বহুবার পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ও কারাবরণ করেছেন।

কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য ১৯৯০ সালে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন। পরবর্তীকালে এ আই এম এস এস-এর সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন। ১৯৮৭ সালে পুরুলিয়া জেলা প্রথম পার্টি সম্মেলনে জেলা কমিটির সদস্য হন। ২০০৬ সালে তিনি পুরুলিয়া জেলা কমিটির সম্পাদক হন। ২০০৯ সালে পার্টির দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনে রাজ্য কমিটির সদস্য হন। ২০০৯ সালে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে স্টাফ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন।

২০১৬ সালের জুন মাসে অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য তিনি ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তি হন। লিভারের কিছু সমস্যাজনিত কারণে ১০ আগস্ট দিল্লির লিভার ইনস্টিটিউটে চিকিৎসার জন্য তাঁকে পাঠানো হয়, সেখানে ক্যান্সার ধরা পড়ে। তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও বিছানায় শুয়ে অসহ্য যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে দলের কাজ চালিয়ে গেছেন। অসুস্থতাকে তিনি তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে কোনও প্রতিবন্ধক হতে দেননি। দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক রোগ ভোগের পর ২৩ মে সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল এক বিরল চরিত্রের আমৃত্যু বিপ্লবীকে।

কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য লাল সেলাম

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক
কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর শোকবার্তা

কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক শোকবার্তা পাঠান। ৪ জুন হাওড়ার শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় সেই শোকবার্তাটি পাঠ করেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভানেত্রী কমরেড নাঈমা খালেদ মনিকা।

কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা বুকে ধারণ করে ভারতবর্ষে বিপ্লবী আন্দোলন নির্মাণের কাজে আজীবন নিয়োজিত ছিলেন।

কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। আমার চিকিৎসার কারণে এবং এস ইউ সি আই (সি)-র মাধ্যমে আমন্ত্রিত হয়ে বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমি প্রায়ই কলকাতায় আসা-যাওয়া করি। সেই সূত্রে তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রত্যক্ষ সাহচর্য ছাড়া, কেবল তাঁর শিক্ষাকে সম্বল করে একজন বিপ্লবী চরিত্র হিসাবে তিনি যেভাবে গড়ে উঠেছিলেন, তাঁর চরিত্রে যে মাধুর্য, সরলতা ও নম্রতার প্রকাশ ঘটেছিল— তা দিয়ে তিনি আমাকে আকর্ষণ করেছিলেন। গভীর আবেগে, মমতায়, ভালবাসায় তিনি পশ্চিমবঙ্গের দুটি জেলায় সংগঠন গড়ে তুলেছেন। তিনি জননেতা ছিলেন। সাধারণ মানুষকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও সমর্থন পেয়েছেন। আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি ছিলেন দৃঢ় ও বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী।

মার্কসবাদী বিপ্লবী রাজনীতির মর্মবস্তু তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর চরিত্রে, জীবনাচরণে তা পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছিল। আমার সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে তখনই তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসামিশ্রিত সাহচর্য আমি উপভোগ করেছি। তিনি তাঁর কাজের এলাকায় অনেক ছেলেমেয়েদের গড়ে তুলেছেন, তাঁদের বিপ্লবী রাজনীতি ও বিপ্লবী জীবন গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাঁদের সত্যিকারের নেতা হয়েছেন। তিনি তাঁর

স্নেহ, মমতা, ভালবাসা ও শাসনে যে ছেলেমেয়েদের গড়ে তুলেছেন তাঁরা সকলেই দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। তাঁদের জন্য এই মানুষটির অনুপস্থিতি একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা। আমি মনে করি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা থেকে শিক্ষা নিয়ে তাঁরা তাঁদের এই বেদনাকে প্রতিজ্ঞায় রূপান্তরিত করবেন।

শেষ সময়ে তিনি ক্যান্সারের সাথে লড়েছেন। প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যেও তাঁর মুখের হাসি কখনও মলিন হয়নি। বিপ্লবী জীবনের গভীর তৃপ্তি, প্রশান্তি ও বিশ্বাস ছিল তাঁর চোখে-মুখে। কমরেড শিবদাস ঘোষের যোগ্য ছাত্র হয়ে উঠলেই এমনটি ঘটে। কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যের এই লড়াই আমাকে এই শেষ বয়সেও বিপ্লবী রাজনীতিতে আরও গভীরতার সাথে নিমগ্ন হতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে পাথেয় করে আমাদের দেশে আমরা বিপ্লবী রাজনীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করছি, কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যের চরিত্র আমাদেরও অনুপ্রাণিত করে। তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর ভালবাসা জানাচ্ছি। দূর থেকে আপনাদের মতোই ব্যথিত মন নিয়ে স্নেহে, শ্রদ্ধায় তাঁকে স্মরণ করছি।

কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য লাল সেলাম